মহাগুরু রমিজ যেভাবে সূফী সাধক (মারেফাতের সাধক) হলেন

আত্মার পবিত্রতা বা আত্মার ভুল সংশোধন করাই হচ্ছে তাসাউফ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর আত্মার এ ভুল সংশোধন করলে আত্মা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করে। রমিজের মতবাদ অনুযায়ী আত্মা, মুক্তিলাভ বা নির্বাণ লাভ করলে তার আর জন্মচক্রের (৮৪ লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ) আওতায় যেতে হয় না। এ মতবাদ সম্পর্কে পুস্তকের শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এবার গুরু রমিজের সূফী সাধন বা মারেফাতের সাধক জীবন নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এল্‌মে তাসাউফ পৃথিবীর আদিম মৌলিক জ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান (বিজ্ঞান) যা মহান স্রষ্টা (আল্লাহ্‌তায়ালা) প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) কে নিজে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে-

"আর তিনি (আল্লাহ্‌) হযরত আদমকে সব বস্তুর নামের জ্ঞান দেয়ার পর ফেরেশ্‌তাদের সামনে হাজির করলেন"। (সূরা বাকারা, ৩১ আয়াত)

মহান স্রষ্টা যে অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে হযরত আদমকে জ্ঞান দান করেছিলেন তাওই তাসাউফ। এ পদ্ধতিতেই (অতীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে) সকল নবী-রাসূল, পীর-পয়গম্বর, অলি-ঋষি, আউলিয়া, অবতার, মহাপুরুষ, মহামানব, মহাজন ইত্যাদি সকলেই স্রষ্টার তরফ হতে বাণী প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

এ পদ্ধতির সাধনাকে "অতীন্দ্রিয় সাধনা" বলা হয়ে থাকে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) একাধারে পনের বছর হেরাগুহায় তাসাউফের সাধনা তথা মোরাকাবা (ধ্যান যোগ সাধনা) করার পর চল্লিশ বছর বয়সে তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌র (স্রষ্টার) পক্ষ হতে ওহী নাজিল হয়। ধ্যান যোগের এ সাধনাও তাসাউফের সাধনা বা অতীন্দ্রিয়ের সাধনা।

প্রকৃত পক্ষে এল্‌মে তাসাউফ আল্লাহ্ (স্রষ্টা) কে প্রত্যক্ষভাবে জানার মহা বিজ্ঞান। শরীয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা আর তাসাউফ হচ্ছে আল্লাহ্‌র (স্রষ্টার) নৈকট্য লাভের আত্মিক উপায়।

এল্‌মে তাসাউফ ইসলাম ধর্মের সে বিজ্ঞানময় দিক শিক্ষা দেয়, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের অন্তরচক্ষু (অতীন্দ্রিয়ের দর্শনেন্দ্রিয়) খুলে যায় এবং অন্তরচক্ষু দ্বারা স্রষ্টার দর্শন লাভ করা সম্ভব হয়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে যে বিভেদকারী বা পৃথককারী পর্দা (দেহ, মন, হৃদয়, আত্মার কলুষতা বা রিপু) রয়েছে এল্‌মে তাসাউফের (অতীন্দ্রিয় সাধনার) অনুশীলনে সে পর্দা অপসারিত হয়ে যায়। ফলে মহিমান্বিত স্রষ্টার একক সত্ত্বা (পরম অসীম সত্ত্বা) বাস্তবে উপলব্ধি করা যায়।

সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মানব জাতির জন্য তার প্রভুর পরিচয় জানা এবং প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অতীব প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। আর এর মধ্যেই মানব জাতির চির শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিহীত রয়েছে।

তাই গুরু রমিজ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও তাঁর নৈকট্য লাভ করার মানসে গৃহ ত্যাগ করলেন। এ সময় তার যৌবন কাল আরম্ভ হয়েছে মাত্র। অল্প বয়সেই তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্রষ্টা-তালাশী জ্ঞানী-গুণী মহৎ লোকদের এবং পীর-ফকির, গুরু-মহাজন, মাওলানা, পাদ্রী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি মাননীয় ও বরনীয় ব্যক্তিদের সাহচর্যে এসে স্রষ্টা (আল্লাহ/ভগবান) সম্বন্ধীয় জ্ঞান চর্চা শুরু করেন। দরবেশ, ফকির ও গুরুদেবদের বারামখ্‌ানা, আখ্‌ড়া, আস্তানা ও ভজনালয়ে আসা-যাওয়া করতেন। মসজিদ, মাদ্রাসা ও হিন্দুদের ভজনালয়েও যেতেন। নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন ভাবাদর্শের জ্ঞান চর্চা করতেন। শরীয়ত মারেফতের বাউল গানের আসর পেলে সেখানেও যেতেন। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন স্বাধ ও অনুভূতি অর্জন করতেন।

সকল ধর্ম ও পথের উপর গুরু রমিজের যথেষ্ট শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ভারত বর্ষের খ্যাতনামা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি সকল তীর্থস্থান ও পবিত্র স্থানে গমন করতঃ সেখানে আধ্যাত্মিক বিষয়বোধ সম্পন্ন মহান ব্যক্তিদের সহচর্যে এসে আত্মতত্ত্ব বিষয় ও বিষয়বোধ সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা করতেন। আর একই কারণে তিনি ভারতের পার্শ্ববর্তী নেপাল, ভুটান, তিব্বত ইত্যাদি দেশের এবং মধ্য প্রাচ্যের ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে পর্যন্ত পর্যটক হয়ে গমন করতঃ ঐ সকল দেশের তীর্থ স্থান ও পবিত্র স্থান এবং মহা মণিষীদের মাজার শরীফগুলোতে অবস্থান করতেন। এ সকল পবিত্র স্থানের সূফী-পন্থী, অলি-আউলিয়া, দরবেশ-কুতুব, মণি–ঋষি, অবতার মহামানব ও মহাজনদের সাথে সরাসরি অথবা তাঁদের খলিফাদের সংস্পর্শে এসে বহুকাল যাবৎ সূফী-তত্ত্ব ও সূফীদের মূলনীতি যথা আত্মশুদ্ধি করণ ও আত্মাকে পবিত্র করণ পূর্বক স্রষ্টার সাথে সম্যক যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান ও পথ পাবার সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা ও অতীন্দ্রিয় সাধনায় ব্রতী হয়ে গেলেন। তথা হতে তিনি এলমূল ক্বাল্‌ব, এলমূল মুকাশাফা ও এল্‌মে লাদুন্নীর জ্ঞান চর্চা করে এ তিন প্রকার জ্ঞানের সমন্বয় করতঃ উক্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশে তিনি এল্‌মে তাসাউফের সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন।

স্রষ্টার প্রতি সূফী সাধকদের সর্বস্ব অর্পণ বা আমিত্বকে অকুণ্ঠ চিত্তে বিসর্জন দেয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে স্রষ্টা ও সূফী সাধকদের নৈকট্য লাভের প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলোকন করে গুরু রমিজ অভিভূত হয়ে পরেন। ইহা সূফী সাধকদের অধ্যাত্ম বিষয়ক মারেফাত বা অতীন্দ্রিয় সাধনারই ফল।

অতঃপর তিনি (গুরু রমিজ) সূফী সাধকদের মারেফাত বা অতীন্দ্রিয় সাধনা ও সূফী মতবাদকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেন। তিনি তাঁর নিজ আধ্যাত্মিক জীবন পরিচালনা করার জন্য সূফী মতবাদকেই বেছে নিলেন।

মারেফাত সম্পর্কে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"হায়রে ছেরাতুল মোস্তাকিম
মারেফাতে দেখবি সাথে রাব্বিল আলামিন"।

বাণী নং-৫৭ (অলৌকিক সুধা)

গুরু রমিজ উল্লিখিত পরিবেশে জ্ঞান চর্চা করতঃ জ্ঞান অর্জন করে সৃষ্টি কর্তার পরিচয় লাভের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন করে নিজ আত্মাকে সাফা বা পরিষ্কৃত (সর্ব পাপ অপসারণ) করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করণের মাধ্যমে পবিত্র করণ করা হয়েছে। একই সাথে তাঁর অন্তর বা হৃদয়ও পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ হয়েছে। তিনি হয়ে গেলেন নিস্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী।

অতঃপর তিনি এল্‌মে তাসাউফ (আত্মার শুদ্ধিকরণ ও স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করার জ্ঞান অর্জন করা) নিয়ে নির্জন বা বিজন এলাকায় অবিরত গবেষণা করতে থাকেন। মানুষের আত্মাকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক স্রষ্টার পরিচয় ও তাঁর সাথে সম্যক যোগাযোগ স্থাপনের জ্ঞান ও পথের দিক নির্দেশনার সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা ও অতীন্দ্রিয় সাধনায় (মোরাকাবায়) মগ্ন হয়ে গেলেন। এভাবে আরো বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পরিবেশে বহুকাল আত্মনিয়োগ করতঃ সাধনায় সফলতা লাভ করে নিজ দেশের আদি বাসস্থানে ফিরে এসে সূফী সাধনায় মনোনিবেশ করলেন।

এখানেও তিনি মোরাকাবা বা নিগূঢ় ধ্যান যোগে অতীন্দ্রিয়ের যোগ সাধনায় মগ্ন থাকতেন। এ অবস্থায় (মোরাকাবা বা ধ্যানে) কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ও শুভক্ষণে সর্ব শক্তিমান স্রষ্টার তরফ হতে তাঁর পবিত্র হৃদয়ে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spiritual philosophy) খুলে গেল।

এই দর্শনের আবির্ভাবে তাঁর অন্তরচক্ষু বা দিব্যচক্ষু খুলে গেল। একই সাথে তিনি দিব্যজ্ঞান অর্জন করলেন।

দিব্যজ্ঞান ও দিব্যচক্ষুর আবির্ভাবে তিনি স্রষ্টাকে সম্যকভাবে পাবার পথ পেয়ে গেলেন। পেয়ে গেলেন তিনি স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা ও আত্মার ভুল সংশোধনের এক সুমহান পথ ও আত্মশুদ্ধি বা আত্মার মুক্তির কর্মের বিধান। এ পথ ও বিধানের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের আত্মার শুদ্ধিকরণ ও নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন পূর্বক মুক্তি ও নির্বাণের পথ দেখিয়েছেন।

১. *এ বিধান সৎগুরু বা চেতন গুরুকে কেন্দ্র করে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের আজীবন অবিরত সৎকর্ম ধারার বিধান।*
২. *এ বিধান আত্মার মুক্তি ও নির্বাণ বা মোক্ষ লাভের বিধান।*
৩. *এ বিধান স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং মানব ও সর্বজীবকে ভালবাসার বিধান।*
৪. *এ বিধান স্রষ্টার নৈকট্য লাভের বিধান।*
৫. *এ বিধান স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সৎগুরু ও পরম ভক্তের প্রেম সাধনার বিধান।*
৬. *এ বিধান সমীম ও অসীমের মিলনের বিধান।*
৭. *এ বিধান মহাবিশ্ব ও বিশ্ব প্রকৃতিতে লয় হবার বিধান।*
৮. *এ বিধানের ধ্যান ও ভাব, সুক্ষ্ম হৃদয়ে ফুটে প্রকান্ড স্বভাব।*
৯. *এ বিধান নিজকে নিজে চেনার বিধান।*
১০. *এ বিধান অতীন্দ্রিয় সাধনের এলহাম, ওহী, দৈববাণী প্রাপ্তির বিধান।*
১১. *এ বিধান খোদকে (নিজকে) চিনে খোদাকে চিনার বিধান।*
১২. *এ বিধান সদ্‌গুরুর মাধ্যমে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠনের বিধান।*

সর্বসৃষ্টি, সর্বজীব ও মানব কল্যাণে ব্রতী হয়ে গুরু রমিজ আধ্যাত্মিক ও মারেফাতের সাধনায় মগ্ন থাকেন। এ অবস্থায় বিশ্বপ্রেম ও ভক্ত প্রেমে প্রেমময়ী হয়ে স্রষ্টার কাছে আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে মোরাকাবা বা নিগূঢ় ধ্যানের মাধ্যমে মারেফাতের উচ্চতম সোপানে (মারেফাতের ৪র্থ স্তর বাকাবিল্লাহ্) পৌঁছে সসীম রমিজ অসীম স্রষ্টা ও বিশ্বপ্রকৃতির সাথে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে গেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনিও এক মহাশক্তিধর, মহাসূফী ও অধ্যাত্মবাদী পরম আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে ভক্তদের কাছে প্রকাশিত হলেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯০৫ সালে দ্বিতীয় বিবাহ্ করায় পারিবারিক কারণে তাঁকে জেলখানায় যেতে বাধ্য করা হয়। জেলখানায়ও গভীর রাতে তিনি মোরাকাবা বা ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। উক্ত ধ্যানের মাধ্যমেই তিনি খূঁজ পেলেন 'পৃথিবী' নামক সত্যিকারের সর্বজীবের জেলখানার সন্ধান। খূঁজে পেলেন তিনি সুমহান স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্য ও আত্মার মুক্তির সন্ধান।

তিনি (গুরু রমিজ) সর্বদা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক এক অনন্ত শক্তির আরাধনা করতেন।

মোরাকাবা, মহা সাধনা আর মহাত্যাগ ও আত্মকর্মের গুণে গুরু রমিজ তার ভক্তদের কাছে মহাসূফী হিসেবে পরিগণিত হলেন। আর তিনি (গুরু রমিজ) সর্বদা অতীন্দ্রিয় অলৌকিক এক মহাশক্তির আরাধনা করতেন বলে তাঁর অনেক ভক্ত বিশেষ করে সনাতন ধর্মের ভক্তবৃন্দ তাঁকে মহাসূফী ও মহাশক্তি বলতেন। সর্বকর্মেই তিনি মহা ও মহান এর ভূমিকায় থাকতেন।

মহাগুরু রমিজ এক সম্ভ্রান্ত পীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশের প্রথম সূফী সাধক হচ্ছেনগুআবু হানিফ ইবন্ আবুবকর ইব্রাহীম, যিনি তাঁর সাহিত্যে ব্যবহৃত 'ফরিদ উদ্দিন আত্তার' ('আত্তার'-Pharmacist বা ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতকারী) নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি একজন পারস্য দেশীয় মুসলিম সূফী কবি এবং সূফীবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষক ছিলেন এবং তিনি পারস্য কবিতা ও সূফীবাদের উপর একটি চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন।

তাঁর জন্ম ১১৪৫ খৃঃ এবং মৃত্যু ১২২০ খৃঃ। তাঁর জন্মস্থান ইরানের নিশাপুর শহরে। নিশাপুর (Nisapur) সংস্কৃত শব্দ ইহার আরবী উচ্চারণ 'নেয়শাবুর' (Neyshabur)। নিশাপুর উত্তরপূর্ব ইরানের রাজাভি খোরাসান (Razavi Khorasan) প্রদেশে বিনালাউদ (Binalaud) পর্বতমালার পাদদেশের উর্বর সমতল ভূমিতে অবস্থিত। বিখ্যাত কবি ও গণিতবিদ ওমর খৈয়াম, সুবিখ্যাত ইরানী

চিত্রকর কামাল উল মলক্, বিখ্যাত মুহাদ্দীস মুসলিম ইবন্ আল্ হাজ্জাজসহ আরো অনেক প্রখ্যাত কবি, মণিষী ও সূফীদের জন্মস্থান এই নিশাপুর শহর।

ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাহিত্যকর্ম, সূফীবাদ (Sufism), অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism) এবং অধিবিদ্যা (Metaphysics) এর ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে আরো বিশাল পরিসরে বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলোঃ (Manteq al-Tayr) তায্কেরাতুল আউলিয়া (Tadkeratul Auwlia)। যারা তাঁর সাহিত্যকর্ম ও মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেনঃ রুমী, হাফেজ জামী, নাভাই এবং আরো অনেক সূফী কবি।

নাভাই, ফরিদ উদ্দিন আত্তারের জন্মস্থান নিশাপুর শহরে তাঁর (ফরিদ উদ্দিন আত্তারের) মাজার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। ফরিদ উদ্দিন আত্তার যে সকল স্থানে ভ্রমন করেছিলেন সেগুলো হলো ঃ বাগদাদ, বসরা, কুফা, মক্কা, মদিনা, দামেস্ক, তুর্কিস্থান এবং ভারত।

তিনি ভারতে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর ভারতীয় বংশ বিস্তার লাভ করে। গুরু রমিজের পিতা হলেনঃ পীরে কামেল হযরত খন্দকার হাজী সূফী পানা উল্লাহ্। আর তিনি উক্ত বংশের শেজরা শরীফ মোতাবেক একাদশতম পুরুষ এবং তিনিই হচ্ছেন গুরু রমিজের পীর বা গুরু। মহাগুরু রমিজ হচ্ছেন উক্ত বংশের শেজরা শরীফ অনুযায়ী দ্বাদশতম পুরুষ।

মহাগুরু রমিজের বংশের শেজরা শরীফ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত সূফী শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহঃ) হতে ক্রমানুযায়ী মহাগুরু মহাসূফী খন্দকার রমিজ পর্যন্ত সবাই সূফী ও সূফী তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

মহাগুরু রমিজ একজন প্রকৃত সূফী হয়েও কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তত্ত্বসমূহের তত্ত্ববিদ হয়ে আজীবন অবিরত তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট সাধনায় মগ্ন ছিলেন। রমিজ পরবর্তী সময়ে বা বর্তমানে যারা তাঁর উত্তরসূরী হয়ে কর্ম করছেন তারাও সূফীবাদসহ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে গভীর বিশ্বাস রেখে রমিজ বিধান অনুযায়ী সকল কর্ম সাধন করছেন। মহাগুরু রমিজ সূফী তত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় সাধনায় বিশ্বাসী ছিলেন তা তাঁর নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি। আর তা হলো তাঁর নীতির বৈশিষ্ট্যগুলোর ৮ম বৈশিষ্ট্য। এই তত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ অত্র পুস্তকে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মেই এমন কিছু নীতি আছে যা সকল ধর্ম মত ও পথের অনুসারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য। এই গ্রহণযোগ্য নীতির অন্যতম হচ্ছে মানবতাবাদ (Humanism)। গুরু রমিজের জীবনে ও জীবনাচরণে, মন ও মননে, কর্মে ও সাধনায় মানবতাবোধ ছিল প্রবল। ধর্মের যাগযজ্ঞময় আনুষ্ঠানিকতা-বিরোধী গুরু রমিজের নিকট কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আত্মশাসন ও আত্মজ্ঞান লাভই মূল বিষয়। সকল ধর্ম ও মতের লোকদেরকেই তিনি সমমর্যাদা দিতেন।

ধর্মের বাহিরে আড়ম্বর সম্বন্ধে তিনি তাঁর এক আপ্তবাক্যে বলেন-

"যাগযজ্ঞে নাহি হয় ঈশ্বর উপাসনা
অরণ্য রোদনে কিন্তু কেহ শোনে না"

আত্মশাসনে বিজয়ী হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"জাগরে এবার মেলরে আঁখি
বলেরে হুংকারে কর্ণকুহরে দিন নাই বাকী।

১। ----------

২। বিজয়ী হও তুমি আত্ম শাসনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে,
জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দেও ফাঁকি"।

তিনি নিরব সাধনা পছন্দ করতেন। নিরব সাধনা বা ধ্যান করার নিমিত্তে তিনি তার মূল বাড়ি ছেড়ে নিজ গ্রামের প্রবহমান এক নদীর (আর সি. নদী) তীরে গ্রামবাসী হতে বিচ্ছিন্ন স্থানে বাড়ি নির্মাণ করেন। নিজ স্ত্রী এবং ছেলেগুমেয়েদের কোলাহল থেকে মুক্ত থাকার জন্যে ১৯০৫ সালে উঁচু দোতলা ঘর নির্মাণ করতঃ দোতলার নির্জন কোঠায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষাংশে একাধারে চব্বিশ বছর উক্ত দোতলার নির্জন কক্ষে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বাইরে কোথাও যেতেন না। তার মধ্যে যোগসাধনা ছিল প্রবল।

অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ মহাগুরু রমিজ নিরহংকার, কর্তব্য সচেতন এবং অসীম ধৈর্য্যের অধিকারী ছিলেন। দিব্যজ্ঞানী রমিজ তাঁর পূর্বের থান কাপড় ও শাড়ি কাপড়ের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ভক্ত কল্যাণে সাধনলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, গুরুতত্ত্ব ও গুরুতে অর্পণ, জ্ঞানতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বচর্চা নিয়ে মগ্ন থাকতেন। এক মূহুর্তও তিনি অযথা সময় নষ্ট করতেন না।

তিনি উপরোল্লিখিত চব্বিশ বছর সময়ে ভক্ত নিয়ে আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা ও বাণী রচনা নিয়ে সময় কাটাতেন। গভীর রাতে ধ্যানস্ত অবস্থায় থাকতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেমের গুণে তার পরম ভক্তগণ তাদের পরম আত্মাকে তাঁর পরম আত্মার সাথে বিলীন করে দিতেন। তিনি হয়ে যেতেন পরম-গুরু সিদ্ধ-পুরুষ। তিনিও তাঁর পরমআত্মা জড়িত মহাশক্তির আবেশ দ্বারা ভক্তদেরকে মহান হৃদয়ে স্থান দিতেন। এ অবস্থায় তিনি নিত্য দিনের নিত্যকর্মের সময় তাঁর বারামখানায় (বর্তমান রমিজ ভবন) ভক্ত নিয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে পরম আনন্দে বিভোর থাকতেন।

পরম গুরু হয়ে তিনি সকল ভক্তের সর্ব কর্ম গ্রহণ করতঃ অতীন্দ্রিয় সাধনের মাধ্যমে ভক্তের সর্ব পাপ মোচন করে তাঁদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতেন। ভক্তের সর্ব পাপ গ্রহণ করতঃ উক্ত পদ্ধতিতে ভক্তের হৃদয়কে

পরিশুদ্ধ করাই শেষ চব্বিশ বছর তাঁর সাধনার মূল বিষয় ছিল। একমাত্র ইহাই ছিল তাঁর ধ্যান, ধারণা ও কর্ম সাধনা।
তাই তিনি তাঁর ভাষায় বলেন-

"গুরু না করলে গ্রহণ
কর্মফল হয় না কর্তন"।

বাণী-৪৩ (স্বর্গে আরোহণ)

"স্বর্গে আরোহণ" পরম ভক্তকে চেতনা গুরুর কাছে অবনত চিত্তে আত্মসমর্পণ ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে উভয়ের পরিপূরক যুগল সাধনা এবং যোগ সাধনায় লিপ্ত হতে হবে। তবেই গুরু-ভক্তের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে।

যোগ সাধনা ঃ যোগ মানে ঐক্য, মিলন, সম্পর্ক, সংসর্গ, অবলম্বন, মাধ্যম। হিন্দু দর্শন মতে- জীব আত্মা ও পরম আত্মার মিলন, তপস্যা, ধ্যান (মোরাকাবা- মুসলিম মতে), সাধনা, সাধনার পথ, কর্ম কৌশল।

গুরু রমিজ যোগসাধনায় (ধ্যান বা মোরাকাবায়) ছিলেন একনিষ্ঠ। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় দর্শনে যোগকে দর্শনের একটি শাখা রূপে গণ্য করার মূলে রয়েছে দর্শনের সাথে মানব জীবনের নিগূঢ় সম্পর্কের স্বীকৃতি। অধ্যাত্ম জীবনের বিশেষ ক্ষেত্রে যাতে পরমসত্তা (স্রষ্টা) ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হন সে জন্যেই যোগকে আধ্যাত্মিক দর্শনের অংশ হিসেবে মর্যাদা দান করা হয়েছে।

বস্তুত অমরত্ব লাভ প্রয়াসই যোগ সাধানার মূল লক্ষ্য। আর এ পথে গুরুবাদ বা গুরুর পথ নির্দেশনা অনস্বীকার্য। সে জন্যেই ফকির, সাধু, সন্যাসী, মুণি-ঋষি, অলি সবাই অকুণ্ঠ চিত্তে গুরুপদে সর্বস্ব নিবেদন করে থাকেন। গুরু রমিজের মতাদর্শে কোন মহিলা গুরু হতে পারেন না। যিনি গুরু হবেন তিনি অবশ্যই রমিজ মনোনীত প্রতিনিধির নিকট হতে এজাজত প্রপ্ত হতে হবে। তিনি প্রতিনিধির আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কোন সত্য সন্ধান কারীকে ভক্ত করতে পারেন।

গুরু রমিজের বিধানেও আত্মার মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করার জন্য অথবা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার নিমিত্তে একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, নিষ্কলুষ এবং চৈতন্য মানবগুরুর প্রয়োজন এবং এই গুরুর নির্দেশনা অনুযায়ী যোগ সাধনা অনুশীলন করতে হবে।

আর সে জন্যেই লালন তাঁর ভাষায় বলেন-

"ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার"।

উক্ত বিষয়ে বা গুরুকরণ সম্পর্কে মহাগুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"সদ্‌গুরুর চরণে তোমার বিকাইও জীবন
অন্তর্যামী অন্তরের ব্যাথা করিবে বারণ"।

উপদেশ-১৭ (অলৌকিক সুধা)

উক্ত যোগ সাধনা প্রসঙ্গে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"চিন্তা কর চিন্তামণি সে কোথায়,
আরশ কুরছি লহুমাফুজে
লেখতে আছে সর্বদায়"।

বাণী-১৮ (অলৌকিক সুধা)

এখানে, যিনি গভীর চিন্তা, ধ্যান বা মোরাকাবার মাধ্যমে স্রষ্টার দূর্বোধ্য গুপ্ততথ্য (রহস্য) উদঘাটন করতে পারেন তিনিই একজন চিন্তামণি। সৃষ্টির বিষয়াদি নিয়ে যে পবিত্র স্থানে (আরশ) অবস্থান করতঃ স্রষ্টা তাঁর আসনে (কুরছি) বসে সর্ব সৃষ্টির তদারক করেন, তা হচ্ছে আরশ কুরছি। (আলমেআরওয়ায় অবস্থিত)।

উক্ত বাণীর অংশে মহাগুরু রমিজ স্রষ্টার অবস্থান সম্পর্কে (মোরাকাবা বা ধ্যান) করতঃ তথ্য নিরুপণ করার কথাই বলছেন। একই সাথে সেখানে সর্ব জীবের সকল কর্ম ও সর্ব সৃষ্টির তথ্য সর্বদা লিখে রেখে রেকর্ড করতঃ সংরক্ষণাগারে (লহুমাফুজ) সংরক্ষণ করা হয় তার কথাও বলেছেন। এ বিষয় সম্মন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য গুরু রমিজ চিন্তামণিদের আহ্বান করেছেন।

গুরু রমিজ বাস্তবে একজন মরমী সাধক ছিলেন। চিন্তা ও চেতনায়, বাস্তব বিশ্বাস ও মননে, সূফী বা মরমী সাধকগণ একেশ্বরবাদী প্রেমবাদী।

রমিজ ছিলেন "স্রষ্টা এক এবং সর্বজীবে, সর্বভূতে সর্বময় বিরাজিত" এই নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি সর্বদা এক স্রষ্টা প্রেমে আত্মমগ্ন ছিলেন। এ সাধনাতে পূর্বোল্লিখিত মুর্শিদ বা গুরুকরণ বা গুরু ধরা অবশ্যম্ভাবী। প্রেমের মাধ্যমেই সূফী সাধকগণ পরম করুণাময় ও আনন্দময় সত্ত্বার সান্নিধ্য কামনা করেন। বস্তুতঃ সূফীবাদকে Islamic Mysticism বা ইসলামীয় মরমীয়াবাদ বা মানবতাবাদ (Humanism, divotion to human interests) বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলা হয়।

মানবতাবাদ অনুসারে স্রষ্টার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনেই মানবের একমাত্র সার্থকতা। কিন্তু এই মিলন বুদ্ধির অতীত স্তরের কোন জ্ঞান প্রসূত বা কোন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ামূলক নয়, ইহা একান্তভাবে হৃদয়াবেগ প্রসূত। মনে রাখতে হবে *"প্রেমই স্রষ্টা ও মানুষের পরিপূর্ণ মিলনের সেতু"*। এই মিলনে মানবের ব্যক্তিগত সত্বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ঐশ্বরিক সত্বায় পরিণত হয়। মানব এবং ঈশ্বর, আল্লাহ্ বা স্রষ্টা তখন ঐক্য লাভ করতঃ উভয়ে একাকার হয়ে যায়। *এই ঐশ্বরিক ঐক্য লাভই গুরু রমিজের (সূফীদের) চরম লক্ষ্য।*

এই সাধনা একাত্মবোধের সাধনা। আল্লাহ্, ব্রহ্ম বা স্রষ্টাকে লাভ করা নয়, তাঁর সাথে এবং তাঁর জাতের সাথে লয় হওয়া বা বিলীন হয়ে মিশে যাওয়াই মূল বিষয়। এ পর্যায়ে সাধক বলতে পারেন *"আমি বাকাবিল্লাহ্ স্তরে পৌঁছেছি বা আমি আল্লাহর (স্রষ্টার) জাতের সাথে মিশেছি বা বিলীন হয়েছি"*। অথবা সনাতন ধর্মের সাধক বলতে পারেন **'অহংব্রহ্মোস্মি'** আমি ব্রহ্ম হয়েছি।

গুরু রমিজ একজন বিশিষ্ট কর্মবাদী ছিলেন। কর্মই ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। মানব সৃষ্ট ধর্মের নামে যাগযজ্ঞময় প্রাচীন প্রথা বর্জন করতঃ গুরু রমিজ ধর্মের ভিতরের মূল নিগূঢ় রহস্যময় মানবতাবাদী করণীয় কর্মগুলো অনুশীলন করতেন।

যে সমস্ত কর্ম করলে মানব, সর্বজীব ও সর্বসৃষ্টির কল্যাণ বয়ে আনবে ঐ সমস্ত কর্মের মধ্যে তিনি একনিষ্ঠভাবে আত্মমগ্ন ছিলেন।

তাঁর কর্মবাদ নীতির মতবাদ অনুসারে ধর্ম মানেই কতগুলো দৈহিক, আর্থিক এবং মানসিক বৈধ কর্মের কর্মাচরণ। যার মাধ্যমে মানবাত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন ও নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করা সম্ভব। আর এর মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের কল্যাণ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মুক্তি।

কর্ম ছাড়া কোন ধর্ম হতে পারে না। কর্মই ধর্মের মূল। তাঁর জীবনে তিনি (রমিজ) কর্মকে অত্যাধিক মূল্যায়ন করতেন। তাঁর মতে কর্মই ধর্ম। সব কিছুর মধ্যে তিনি আত্মকর্মকেই বড় মনে করতেন।

কর্ম-ধর্ম বিষয়ে রমিজ তাঁর এক আপ্তবাক্যে বলেন-

"সবচেয়ে বড় হল আপনার কর্ম,
বিশ্ব মাঝে কর্ম ছাড়া নাহি কোন ধর্ম"।

উপদেশ-০১ (অলৌকিক সুধা)

গুরু রমিজ তাঁর সঙ্গীত বা বাণীর তিনটি পুস্তক রচনা করেছেন। এ তিনটি পুস্তকের সঙ্গীতগুলোর মধ্যে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, লোকজ, মরমী বা মারফতি, বাউল, ধ্রুপদ (ক্লাসিক্যাল), বিচ্ছেদ, শ্যামা ও স্তুতি ইত্যাদি রয়েছে। তিনি তাঁর রচিত বাণীতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল ধর্মের মানুষকে সমঅধিকার প্রদান করেছেন। সকল ধর্মেই মানবতার সমর্থন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

সকল ধর্মের সার কথার সমন্বয়ে মানবতার ধর্মকেই (Human Religion) তিনি উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। মহাগুরু রমিজের বাণী দিব্য (অলৌকিক বা স্বর্গীয়) প্রেরণায় রচিত। *প্রেম-বিচ্ছেদে, বিষাদে, আত্মশাসনে, আত্ম চেতনায়, গুরু আদেশে-আশীর্বাদে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দ-বিরহের উপাদানে রচিত এসব বাণী বা গানের ভিতর ধ্যানমগ্ন দিব্যানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে যা কখনো সহজ, কখনো রূপকের আবরনে প্রচ্ছন্ন।*

গুরু রমিজের রচনায় মিষ্টিক স্পর্শ (মরমী বা অতীন্দ্রিয়বাদী) যেমন সুস্পষ্ট তেমনি তাঁর অনেক গান সাহিত্যের দিক থেকে চিরস্থায়ী অমূল্য সম্পদ।

'পাখি' এই রূপক লালন শাহ্‌র গানে যেমন পাই তেমনি গুরু রমিজের অনেক গানেও এই পাখির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। লালন শাহ্ যেখানে বলেছেন- "খাচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়"।

সেখানে গুরু রমিজ বলেছেন-

"অচিন এক পাখি কি সুন্দর
দীল কাবাতে নিজ ইচ্ছাতে বিরাজ করে নাই তার ডর"।

রমিজের অনেক বাণীতে পাখির উপমা বার বার এসেছে। দেশজ অতি পরিচিত এই পাখি রূপকের মাধ্যমে (উপমার মাধ্যমে) উভয় লোক কবিই আমাদেরকে এক নতুন ভাব রাজ্যে নিয়ে যান। রমিজের বাণীতে, আদেশ-উপদেশে বা আপ্তবাক্যে অধ্যাত্ম চেতনার সুর অনুরনিত বা প্রতিধ্বনিত। সনাতন ধর্মের যারা শ্যামা মায়ের নামে পশু বলিদান করছেন তাদের তিনি অজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গুরু রমিজের মতে শ্যামা মা মানবসহ সকল প্রাণীরই মা। মায়ের মনোরঞ্জন বা মাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে তার এক সন্তান অপর এক বা একাধিক সন্তানকে মায়ের চোখের সামনে বধ করবে ইহা হতে পারে না। মায়ের কাছে সকল সন্তানই সমান এবং সমঅধিকার ও মমতা প্রাপ্য।

পশু বলিদানের বিষয়টি মায়ের কাম্য নয়। পশু বলিদান পূর্বক ইহার মাংস উদরস্ত করার প্রচলিত প্রথা মানব রচিত একটি লিপ্সা বা লোভ জাতীয় অপসংস্কৃতি বিশেষ। এ প্রসঙ্গে রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"মা তোরে কে বলে কালি
তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া ভক্তেরে দেও চরণ ধূলি"।

১। ----------

২। ----------

৩। তুমিতো ত্রিজগত মাতা, অন্তরে তোর নাইগো ব্যাথা মা হয়ে সন্তান হত্যা, এ বিধান তুই কেমনে দিলি।

৪। রমিজ বলে মায়ের সন্তান, মায়ের কাছে সকল সমান
মায় চায় না সন্তানের প্রাণ, অজ্ঞান যারা দেয়রে বলি।

গুরু রমিজ অনেক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন। শ্যামা মায়ের প্রতি তাঁর অনেক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে। মায়ের স্তুতিমূলক অনেক বাণী তিনি রচনা করেছেন।

শ্যামা মাকে অনেক কাছে পাবার পথ দেখানোর জন্য এবং মায়ের চরণ (বিধান) তার অন্তরে স্থাপন করতঃ মায়ের কৃপা ও দয়া পাবার জন্য স্তুতি বাণীতে ব্যাকুল হয়ে আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

তাঁর ভাষায় তিনি শ্যামা মাকে অতি কাছে পাবার জন্য এবং তাঁর চরণ ধূলি পাবার আশায় বলেন-

"মাগো তুমি থাক কাছে
আমি তোমার অজ্ঞান ছেলে তুমি ছাড়া আর কে আছে"।

১। তুমি মা আঁধারে আলো, পথ দেখায়ে নিয়ে চল
ভয় আর কারে করি বল, তুমি যদি থাক পাছে।

২। মাগো আমি যেন না যাই ভুলে, এই নিবেদন চরণ তলে
কৃপা কর অধম বলে, তুমি বিনে সব মিছে।

৩। রমিজ বলে মায়ের চরণ, অন্তরেতে কর স্থাপন
যত দুঃখ তোর হবে বারণ, মায়ের দয়া যে পেয়েছে।

গুরু রমিজের বাণী রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি অল্প বয়স হতেই রচনা আরম্ভ করেন। তিনি যা কিছুই রচনা করতেন তা সাথে সাথে অন্যেরা লিখে রাখতেন। এ বিষয়ে চিন্তাগুভাবনা করে তিনি সময় কাটাতেন না। তাৎক্ষণিক রচনা করা এবং ভক্তগণ তা লিপিবদ্ধ করে রাখা, ইহা ছিল তাঁর সারাজীবনের একটি রচনা নৈপুণ্য। বাল্যকাল হতেই তিনি তৎকালীন কবিগানের আসরে পরিবেশগতভাবে তাৎক্ষণিক রচনা করে এবং স্বরচিত গান গেয়ে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি পরিবশেগত কারণে মারেফাত জগতে ঢুকে পরেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে মারফতি গান রচনা করতে থাকেন। এ সমস্ত গানের কথা বা বাণী তাঁর নিজ গ্রামের ভক্ত জনাব মুন্সী আব্দুল মান্নান সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। রমিজ তেমন কোন লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন না। তাঁর মধ্যে শিক্ষিত পটুত্বের চেয়ে স্বতঃস্ফুর্ততাই বেশি ছিল। রচনার এ বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই অর্জিত হয়েছিলো। প্রকৃতির সাথে তিনি লয় হয়ে গেছেন। তাই, তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক স্বভাব কবি। *মহাবিশ্ব প্রকৃতিই ছিলো তাঁর শিক্ষাগুরু।*

তিনি তাঁর রচনায় বাংলা শব্দ বা বাক্যের সাথে কোর-আন ও হাদীস এর আরবী শব্দ ও বাক্য অতি চমৎকারভাবে সংযোজন করতেন। ইহাতে সুর ও ছন্দের অতি চমৎকার মিল ছিলো। এ ধরনের একটি বাণী তাঁর ভাষায়- ***"হায়রে অতারা জেউনা***

ওমা ইউদলি মিউন ফাহুন কুল হামুনা।"

১। *মনরে লায়ল্লা কুম লাইউবছেরুন তাসকুরুন,*
ছোম্মুন বোকমুন ইয়া রাউন আনফুছুনা।

২। *আজরা নারান তাওকাদান ইয়া মোশরেকিনা,*
লাহাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইন্নাহু কান।

৩। *ইন্না রামিজা মোস্তাকিনা ফাছাম্মা ওয়াজহুনা,*
আল্লা ইন্না তাওক্কালতু ইন্নাকা রাব্বানা।

বাণী-১৭১ (স্বর্গে আরোহন)

গুরু রমিজের মধ্যে এল্‌মে মারেফাত প্রকৃতিগতভাবেই উন্মোচিত হয়েছে এবং একই ধারায় তাঁর মধ্যে সূফীতত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞান বা এল্‌মে তাসাউফের তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়েছে। সূফীদের তত্ত্ব অনুযায়ী তিনি আত্মশুদ্ধি করতঃ তাঁর আত্মাকে পরিশুদ্ধ (পবিত্রকৃত) করেন এবং বিশ্ব প্রকৃতি ও স্রষ্টার কাছে নিজকে বিলীন করে দিলেন।

এ আত্মবিলীন করা অবস্থায় তাঁর ভাষায় তিনি বলেন-

"তুমি বিনে কারে কই আপনা বন্ধুয়ারে,
কে বুঝবে আমার বেদনা"।

১। বন্ধুরে, তুমি আরশিল্লে মোমেনা, ব্রহ্মান্ডে আছে জানা,
দেখাও তুমি কুন্‌ফাইয়া কুনা অ বন্ধুরে, জীবনের যত পাপ,
এবার তুমি কর মাফ রে, এ হল আমার আরাধনা।

২। বন্ধুরে, তুমিতো দয়াল পতি, তুমি বিনে নাই গতি;
তুমি ছাড়া কারে কই আপনা অ বন্ধুরে, জানাও তুমি দয়া করে
দ্বীনহীন এ দাসেরে, কি দিয়া তর করি ভজনা।

৩। বন্ধুরে, আমি অপরাধী এ ভূমন্ডলে, জানাই তোমার চরণ তলে,
কি করিলে হইবে মার্জনা অ বন্ধুরে, দয়া করে এ দাসেরে,
দেও দেখা থাক ঘরে রে, শ্রীচরণ তোর করি বন্দনা।

৪। রমিজ কয় কে বুঝবে বেদন, তোর পদে এ নিবেদন
দেখা দিয়া পুরাও বাসনা অ বন্ধুরে, যদি তুমি থাক ধারে,
চাইনা কিছু এ সংসারে রে, দাসেরে দেও চরণ দু'খানা।

বাণী-৫৯ (স্বর্গের সুধা)

গুরু রমিজের বাণী রচনার আরো একটি বৈশিষ্ট্য বা কৌশল হলো এই যে, তিনি বাণীর আরম্ভে (স্থায়ীতে) কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের সমাধান পাবার নিমিত্তে একটি প্রশ্নমূলক সমস্যা উপস্থাপন করেন। অতঃপর প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি অন্তরাতে (বিষয়ের বর্ণনাতে) বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সর্বশেষ অন্তরায় (স্তবকে) তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করতঃ বাণী আরম্ভের উল্লেখিত সমস্যাটির একটি চমকপ্রদ দার্শনিক সমাধান দিয়ে থাকেন।

রচনার এই একটি রীতির মাধ্যমে সকল পাঠক/পাঠিকা রচিত বিষয়ের উদ্দেশ্য, সমস্যা ও সুষ্ঠ্য সমাধান পেয়ে থাকেন।

উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি বাণীতে তাঁর ভাষায় বলেন-

"মন দেখে শুনে কেন আছ ভুলে ?
আসা যাওয়া তোর হল না বন্ধ
খেটে মরবি ভবের জেলে"।

১। আসা যাওয়া জীবের কর্মগতি, কারে তুমি জানাও স্তুতি,
কেহ নয় কার সাথী, ভালমন্দ সব কর্মফলে।
২। কেউ কানা কেউ দেওয়ানা, কেউ লেংড়া কেউ খেতে পায় না,
কেউ করে আমীরানা, বিচার কর নিজের দিলে দিলে।
৩। তুমি বল আন্‌ছি ইচ্ছা করে, যা চেয়েছি দিয়েছে মোরে,
আমি বলি তা হয় কি করে, পিতায় কি কখন ফেলে জলে ?
৪। যদি বল এইসব বিধির ইচ্ছা, তবে সাধন ভজন সবই মিছা,
সমান হবে রাজা প্রজা, বিচার হবে না কোন কালে।
৫। রমিজ কয় এইসব শোনা কথা, এক কথার নাই আগামাথা,
ঠিক করে নেও কর্মখাতা, মুক্তি পাবি ধরাতলে।

বাণী-০১ (অলৌকিক সুধা)

এই বাণীর মূল বিষয়বস্তু হলোও মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা জীবের জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসা এবং মৃত্যুর পর আবার চলে যাওয়া প্রসঙ্গে। এ বিষয়টি আমরা দৈনন্দিন দেখছি। আত্মার ভুলের জন্যই পুনরায় তাঁর জন্ম নিয়ে ভবরূপ জেলখানায় আসতে হয়। গুরু রমিজ পৃথিবীকে কর্মফল ভোগ করার একটি জেলখানা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

এ বিষয়টি বিবেক ও জ্ঞান দ্বারা দেখে শুনেও মানুষ কেন ভুল করছে তাগুই মনকে বিবেক দ্বারা জিজ্ঞাসিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখানে বাণীটির প্রথমেই পৃথিবীতে আত্মার আসা যাওয়া নিয়ে একটি সমস্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। বাণীটির ১ হতে ৪ নং অন্তরা পর্যন্ত লেখক

বিভিন্ন বাস্তবমূখী যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক ৫ নং সর্বশেষ অন্তরার কথা অনুযায়ী প্রমাণ করেছেন যে, জন্মচক্র হতে মুক্তি পেতে হলে একজন চেতন গুরু বা সৎগুরুর মাধ্যমে সঠিক কর্ম তালাশ করে তাঁর প্রদর্শিত বিধান ও আদেশ মোতাবেক সকল কর্ম সম্পন্ন করতে হবে এবং তাহলেই পৃথিবীতে আসা যাওয়া বন্ধ অথবা রোধ হয়ে যাবে।

এভাবে গুরু রমিজ তাঁর বাণীগুলোর প্রথমেই সমস্যা জড়িত জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেন এবং অবশেষে তিনি নিজেই তাঁর সমাধান দিয়ে থাকেন।
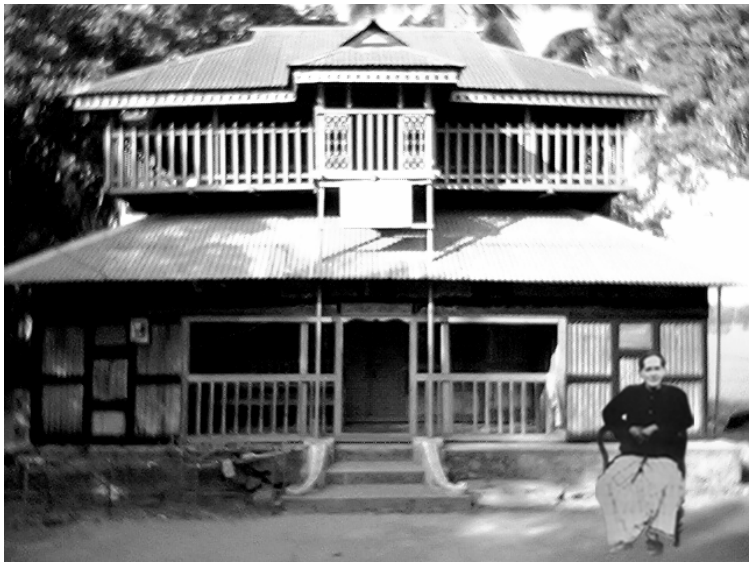
এই রীতি অনুসারে তাঁর ভক্তগণ রচিত বাণীগুলোর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জটিল সমস্যা ও উহার সমাধানের পথ পেয়ে থাকেন। মহাগুরু রমিজ এই প্রক্রিয়ায় তাঁর ভক্তগণকে জ্ঞানার্জনের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। *ইহা একটি অভিনব অধ্যাত্ম বিষয়ক জ্ঞান চর্চার পথ ও পাথেয়।*